THE IMPRESSION, A Journal on Multidisciplinary Studies, A Peer Reviewed Journal
VOL. X, Annual Issue (2023) (ISSN: 2278-2699)

‘গহিন গাঙ’ উপন্যাসে সমকালীন আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট ও জীবনজীবিকা

অর্পিতা বোস*

সারসংক্ষেপ: *ভারতের সীমান্ত সংঘর্ষ, সাম্যবাদী দলের প্রত্যক্ষ ভাঙন, চারদিক থেকে মধ্যবিত্তর মনে তৈরি হওয়া অস্তিত্ব সংকট, এই ঘটনা গুলো যখন ঘটছে তখন সেই রকম সময় লিখছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। তার জীবন জীবিকা ও সমাজ জীবন মূলক উপন্যাস এর মধ্যে “গহীন গাঙ” (১৯৭৯) উল্লেখ করার মতো। উপন্যাস টিতে জেলে জীবনের এক কঠোর সংগ্রামী জীবন তিনি তুলে ধরেছেন । জীবনের বেশিরভাগ সময় তারা নিজেদের জীবন প্রতিপন্ন করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা একবার যদি মহাজনী সুদের বেড়াজালে ঢুকে পড়ে তাহলে আর বের হতে পারে না। বাস্তব এই সমাজ চিত্রই তিনি এখানে দেখালেন । পাশাপাশি এরকম আরো কিছু উপন্যাস তুলনায় আনা হয়েছে এই লেখায়। যেমন- “তিতাস একটি নদীর নাম”, “জলপুত্র” উপন্যাস, “ইলিশমারির চর”। আসলে সব উপন্যাস গুলোর মূল সুর একই। তাদের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসেব নিকেশ এর পরেও শোষণের হাহাকার টাই প্রধান হয়ে উঠেছে । আলোচ্য উপন্যাস ও তার ব্যাতিক্রম নয়।*

সূচক শব্দ: *অন্তরাল, প্রান্তিক, খটিদার, বিপদসঙ্কুল।*

মূল প্রবন্ধ : বাংলা কথাসাহিত্যে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব খাদ্য আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ সময়ে। সে সময়ে গোটা পশ্চিম বাংলা হয়ে উঠেছিল উত্তাল। এদিকে কমিউনিষ্ট পার্টিতেও চলছে অভ্যন্তরীন সংঘাত। তীব্র খাদ্য আন্দোলন, চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সংঘর্ষ, সাম্যবাদী দলে প্রত্যক্ষ ভাঙন, চারদিক থেকে মধ্যবিত্তর মনে অস্তিত্ব সংকট প্রভৃতি ঘটনাগুলো এই সময়ে ঘটে যাচ্ছে। সত্তরের দশকের অন্যতম সাধন চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৬ সালে নন্দন পত্রিকায় তাঁর প্রথম ছোটোগল্প ‘বন্যা’ প্রকাশিত হয়।

অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছেন -

> “সাধন চিরকাল গতির পথে, পুনর্নবায়নের পক্ষে, পন্য সর্বস্ব ভোগবাদমুগ্ধ কালপর্বে তিনি গল্পকে ব্যবহার করেন, করতে চান, আঁধার মহিষকে ভিন্ন ভিন্ন করার কৃপণ হিসাবে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিপুন সৈনিক যা করে, সাধন ও তেমনি ক্ষুরধার খড়গে শান দিয়ে যান ক্রমাগত।”(১)

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিকে অনেকগুলো ভাগেই বিন্যস্ত করা যায়। আমরা এখানে জীবন - জীবীকা ও সমাজ - জীবনমূলক উপন্যাস হিসাবে “গহিন গাঙ” (১৯৭৯) কে নিয়ে আলোচনা করবো। উপন্যাসটি ‘প্রান্তিক’ পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সুন্দরবন অঞ্চলের মালো সম্প্রদায়ের জনজীবন, জীবিকা, তৎসহ সমকালীন আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটকে লেখক খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করেছেন। জেলেদের এক কঠোর সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন এখানে লেখক। কলকাতায় আসতে চাওয়া একদল যুবকের ব্যর্থ আত্মত্যাগ, ঠিক সেরকম মধ্যবিত্ত একদল মানুষের দোদুল্যমান অবস্থার কথাও লেখক চিত্রিত করেছেন। বেঁচে থাকার তাড়নায়, জীবন জীবিকার স্বার্থে মানুষ স্বীকার করতে গিয়ে নিষ্ঠুরভাবে নিজেরাই শিকার হচ্ছে-

*State Aided Collage Teacher (SACT), Department of Bengali, Sree Chaitanya Mahavidyalaya
E - Mail Id: abose896@gmail.com

> "বেঁচে থাকার এই একটি কৌশলই জন্ম থেকে শিখতে হয় কবে থেকে কেউ জানে না। পৃথিবীর বুকে নদী সমুদ্রের কূল ধরে ছুটে বেড়ায় জীবিকার সন্ধানে। গাঙে মাছ ফুরিয়ে গেলে, তারা নতুন আস্তানা গড়ে। এখানে ও দিনে দিনে মাছ যত অশ্রুভূল হয়ে উঠছে, বাড়ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিনা-গলে এই বেতনা হাঁসফাঁস করে। তখন আশঙ্কায় মালোরা ছুটে চলে, গাঙ চেয়ে আরও দক্ষিনে, ওই মোহোনার খাড়ি, জঙ্গলের দিকে।"(২)

অধিকাংশ মানুষ নিজেদের জীবন উৎপন্ন করে মধু সংগ্রহ করে, কাঁকড়া মাছ ধরে। বাঘ - কুমীর এদের নিত্যসঙ্গী। এছাড়াও আছে ঝঁনের বড়ো বোঝা। 'গহীন গাঙ' উপন্যাসে আমরা পাই বেতনা নদীকে। মালো সমাজের জীবনপ্রবাহের মতোই এই নদীও শান্ত-নিস্তব্ধ। ললিত মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের পেটে চলে যায়। শ্রীপদ সেই খবর সবাইকে দেয়। উপন্যাসে ব্যবসায়ী আব্দুল মহাজনের ফন্দি ফিকির সুদের বেড়াজালে মালোরা জেরবার। আব্দুল মহাজন মালোদের মাছ ধরার জন্য আগাম দাদন হিসেবে টাকা ধার দেন কিন্তু তার বদলে মালোরা কম দামে বা কখনো কখনো নিজেদের লোকসানে তার কাছে মাছ বেচে-

> "আবদুলের তর্জন গর্জন এবং ঘাটবাবুর ফুট কাটার মধ্যে একটা গভীর অর্থ অঙ্গীভূত। এক অন্তরাল স্বার্থের যোগসূত্র তৈরি হয়ে আছে। এই সুতোর টানেই যেকোনো মূল্যে মাছ বেচতে বাধ্য হয় মালোরা।"(৩)

গহীন গাঙ' উপন্যাসে সাধন চট্টোপাধ্যায় নেমে এসেছেন সুন্দরবনের প্রান্তিক জনজীবনের মধ্যে। সেখানে মানুষ মহাজনের কাছে ঋনের দায়ে জর্জরিত হয়ে পড়ে। সেই ঋনের জাল থেকে বেরোবার অগাধ বাসনা নিয়েও সেই চক্রবূহে তারা থেকে যায়।

ললিতের মৃত্যুর পর শ্রীপদ সিদ্ধান্ত নেয় সে আর কখনো জঙ্গলে যাবে না। কিন্তু জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার তাগিদে তাকে মাছ ধরতে যেতেই হলো। নৌকা ও জালের মালিক আবদুলের কবল থেকে বাঁচা তাই দুঃসাধ্য। শ্রীপদর দুর্দিনে তাই ভরসার জায়গা ডাক্তারবাবু। মালোরা জানে খটিদারের কাছে মাছ বিক্রি করলে তারা উপযুক্ত টাকা পায় না। খটিদারের কাছে বার বার ঠকে যায় মালোরা। রাজনীতিগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারবাবু শ্রীপদকে সাবধান করে বলেছিলেন,

> "শ্রীপদ, তোমরা কিন্তু ঘোড়াটা জোড়েই ছোটাচ্ছ, গাড়ি উল্টে যাবার ভয় আছে। তোমার চেতনার চেয়েও এ গাঙ কিন্তু গহিন।"(৪)

আঙ্গুল উচিয়ে গঞ্জের এই সমাজটাকে নির্দেশ করেছিলেন সেদিন। শ্রীপদ সেদিন তর্ক করেনি, হেসে জবাব দিয়েছিল,

> "আপনার ঐ আলুনি পান্তা আর পেটে রোচে না আমার। কো অপারোটিভ কি দেশটা পাল্টে যাবে।"(৪)

মালোরা কখনই সুখের মুখ দেখতে পায় না। জীবনের দুঃসময়েও শ্রীপদর ঘরে আসে ছেলে সন্তান।সেই সন্তানের কথা চিন্তা করে শ্রীপদ কো অপারেটিভ এ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কারন সেখানে মাছ বেচলে মুনাফা বেশি হয়। ললিত ও ঘটিদারের সঙ্গে ঝগড়া করে কো অপারেটিভে গেছিল, কিন্তু আবদুল সেই সম হিসাব রেখেছে। ললিত বিপদের সময় তাদের কাছ থেকে টাকা ধার এনেছিল এবং কয়েক কিস্তিতে তা শোধও করেছিলো। কিন্তু মৃত্যুর পর হঠাৎ জানা যায় তিন বছর আগে ধার করা পঞ্চাশ টাকা বর্তমানে সুদে আসলে দুইশত পয়তাল্লিশ হয়েছে। ললিত যে চেষ্টা করত সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে চেয়েছিল শ্রীপদ

> "ললিতের অসমাপ্ত লড়াই আবার শুরু করতে চায় নতুন মোবক শ্রীপদ, যে উত্তর প্রজন্মের প্রতিভূ। দয়ালের সঙ্গে তার মতবিরোধকে লেখক কেবল দুই প্রজন্মের দূরত্ব হিসাবকেই দেখেন না, দেখেন জীবন প্রত্যয়ের, অর্থাৎ জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যের নিরিখে।"(৫)

উপন্যাস যত এগোয় দেখা যায় শ্রীপদের দুঃসময়ে কাল হয়ে দাঁড়ায় সহোদর লগাই। লগাই আবদুলের কুচকান্তে সঙ্গী হয়।

শ্রীপদকে আঘাত করার জন্য বাবার মৃত্যু নিয়ে থানায় এফ আই আর করে। আর একদিকে সাম্প্রদায়িক বিদেশের ঘটনায় শ্রীপদকে জড়ানো হয়। এত ধরনের আঘাত শ্রীপদ আর কত সহ্য করবে। বড়বাবুর নির্দেশে তাকে থানায় যেতে হয়। কি করবে তার দিশে পায় না শ্রীপদ এরকম অবস্থায়। এই রকম পরিস্থিতিতে শ্রীপদ শুধু মনে করে ডাক্তারবাবুর কথা, যিনি রক্ষাকর্তা। কিন্তু ডাক্তারবাবুর থেকে কোনো আশ্বাস পাওয়া যায়নি শেষাবধি। শিকারিরা যেভাবে চারা দিয়ে ফাঁদ পেতে বসে আবদুল ও সেভাবে শহরের লোভনীয় চটক দেখিয়ে লগাইকে হাতে নেয়। লগাই এই আশায় ছিল সে আবদুলের দেলিতে সেচ অফিসে কাজ পাবে। কিন্তু অবশেষে লগাই আবদুলের ফাঁদে পা দেয়। উপন্যাসে দেখা যায় নায়কের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকৃতি যেন ভয়াবহ আকার নেয়। বৃষ্টি-বাতাশ সবকিছু মিলে বেতনা নদী ফুলে ফেঁপে উঠছে। কিন্তু এসবকিছু সত্বেও শ্রীপদকে দক্ষিণে যেতেই হল। নিম্নজীবী এই মানুষগুলোর ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া বলে কিছু নেই। তারা উচ্চবর্গের প্রভাব প্রতিপত্তি আদেশ নির্দেশ অমান্য করে কখনও বের হতে পারে না। জীবন সংগ্রামে তারা হেরে যেতে বাধ্য হয়।

'তিতাস একটি নদীর নাম' অদ্বৈত মল্লবর্মন এর লেখা একটি বিখ্যাত উপন্যাস। এই উপন্যাসে গ্রামের দরিদ্র মালো শ্রেণীর লোকজনের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। নিম্নজীবী মানুষের এক অনুভবী বাস্তবতার নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম'। এখানে পাই 'তিতাস' নদীকে। যার তীরে মালোদের বাস। ঘাটে বাঁধা নৌকা, মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোনে পারের মটকি, ঘরে ঘরে চরকি, টেকো, তকুলি সুতা কাটার, জাল বোনার সরঞ্জাম, এই সব নিয়েই মালোদের সংসার জীবন। মস্ত বিরাট গ্রাম দিনের কোলাহল রাতেও চাপা পড়ে না। দক্ষিন পাড়াঁগা মালোদের। তিতাস নদীর প্রশস্ত তীর, বর্ষায় সে বটের ঝুড়িঁতে বঁড়শি ফেলত, সুদিনে তারই তলা ছিল গরমের দুপুর কাটাবার ভালের জায়গা। মাছের জো ফুরিয়ে গেছে, মালোদের অফুরন্ত চাহিদা মেটাতে মেটাতে 'তিতাস' ক্লান্ত হয়ে গেছে। দুপুর পর্যন্ত জাল ফেলা জাল তোলা চলে, মাছ আর ওঠে না। জালের হাতায় হ্যাঁচকা একটা টান মেরে কিশোর বলে, জগৎপুরের ডহরে যা সুবলা, 'ঐ খানে ত জালে মাছে এক করা গেল না।' তিতাস যেখানে মেঘনা-য় মিশেছে, সেখানে যেতে দুপুর গড়ায়, কিশোর দাঁড় তুলে একটু চেয়ে রইলো। অনুভব করলো মেঘনার বিশালত্বকে। ভৈররের ঘাটে থাকে ঘুঁটি - বাঁধা কিছু নৌকা, পাশে জাল পরে আছে, পাশে গারের মটকি গামলা বেতের ঝুরি মালোদের বাস এখানে। মালোদের গ্রাম আগে বড় ছিল। কিন্তু রেলকোম্পানি অনেকটা জায়গা নিয়ে নিয়েছে।

> 'কিশোরদাদা, ভৈরবের মালোরা কি কান্ড করে জান নি? তারা জামা-জুতা ভাড়া কইরা রেলকম্পানির বাবুরার বাসার কাছ দিয়া বেড়ায়, আর বাবুরাও মালোপাড়ায় বই আ তামুক টানে আর কয়, পোলাপান ইস্কুলে দেও, -শিক্ষিত হও শিক্ষিত হও।'

বেশ বড় বন্দর ভৈরব যেখানে জাহাজ নোঙ্গর করে কোনো নৌকা শুধু শুধু বসে নেই। তবে বন্দর এলাকা পর্যন্তই কর্মচঞ্চল্য। একটু এগোতেই বিশালতা মিলিয়ে যায়।

কিশোরের নৌকা এগিয়ে চলে। কিন্তু জনবসতি নেই, গাছপালাও। নদী অবাধ-অগাধরূপ দেখতে দেখতে কিশোর গান ধরে-

উত্তরের জমিনে রে, সোনা বন্ধু হাল চষে,
লাঙ্গলে বাজিয়া উঠে খুয়া
দক্ষিণা মলরায় রায়
কার ঠাঁইচান্দমুখ শুখাইয়া যায়,
পাঠাইব পান গুয়া।

তিতাস নদী থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করা, একদল জেলে সম্প্রদায়ের (মালো সমাজ) জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখলেন উপন্যাসিক। মালো নর-নারীর ব্যক্তিগত জীবন, তাদের গোষ্ঠী জীবনের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পাশাপাশি তিতাসের উপর নির্ভরশীল মালোদের জীবন ও জীবিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় আছে এখানে। এই উপন্যাসে অন্যের নৌকায়

শ্রমিক হিসেবে কাজ করা সুবলের মতো দরিদ্র জেলে থেকে শুরু করে উজানিনগরের কাশিরাম মোড়লের মতো ধনী প্রতাপশালী জেলেদের কথা ঔপন্যাসিক দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। নদী নির্ভর জীবন প্রায় ঝুঁকিপূর্ন। মেঘনার সে মোহনায় তারা বিপদগ্রস্ত হলো সেটিও বিপদসঙ্কুল। এ প্রসঙ্গে এসেছে উপন্যাসে-

> "মোহনাটি সত্যই ভয়ংকর। এপার হইতে ওপারের কূল কিনারা চোখে ঠাহর করা যায় না। হু হু করিয়া চলিতে চলিতে স্রোত এক একটা আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। দুই ধারের স্রোত মুখামুখি হইয়া যে ঝাপটা খাইতেছে, তাহাতে প্রচন্ড শব্দ করিয়া জল অনেক উপরে উঠিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।"

শুধু মালোরাই নয়, তিতাস নদীর তীরের মুসলমানদের জীবনের সঙ্গেঁ ও নদীর সংযুক্ত গভীরভাবে। তিতাসকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনও আবর্তিত। কাদির মিয়া দুদির মিয়ার মাধ্যমে সে নির্ভরশীলতার ছবি আমরা দেখতে পাই। হিন্দু-মুসলিম একে অপরের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিল। নানা ঘটনার মাধ্যমে, বিশেষ করে বনমালী ধনঞ্জয়ের কাদিরের প্রায় ডুবে যাওয়া অপর নৌকা উদ্ধারের চিত্রের মধ্যে। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে মহামারীর মতো মৃত্যু এসে মালো সমাজকে নিশ্চিহ্ন ও সর্বশান্ত করে দেয়। প্রায় বিলুপ্ত সেই সুবিশাল মালোপাড়া কালের সাক্ষী হয়ে থাকে। শেষে মালোপাড়ার এই ছবি ফুটে ওঠে -

> 'ধানকাটা শেষ হইয়া গিয়াছে। চরে আর একটিও ধানগাছ নাই। যেখানে এখন বর্ষার সাঁতার জল। চাহিলে কারো মনে হবে না যে এখানে একটা চর ছিল। জলে থই থই করিতেছে। সে মালোপাড়া আর নাই। শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সো সো শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দের তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলে।'

এই উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছে তিতাস নদীর শুকিয়ে যাওয়া। যে নদীকে কেন্দ্র করে মালো জীবনের বিস্তার বৃদ্ধি সমৃদ্ধি, সেই নদী যদি হারিয়ে যায় শুকিয়ে যাওয়া। যে নদীকে কেন্দ্র করে মালো জীবনের বিস্তার বৃদ্ধি সমৃদ্ধি, সেই নদী যদি হারিয়ে যায়, শুকিয়ে যায় তাহলে এদের গোষ্টী-জীবনে অস্তিত্ব টেকে না। উপন্যাসের শেষে মালোরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাসন্তী আর অনন্তের সম্পর্কের ভাঙন যে মালো সমাজেরই ভাঙনের ইঙ্গিত, আমরা তা জেনেছি, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংস্কৃতিতে ভাঙন। পাশাপাশি নাগরিক জীবনের হাতছানি। অনন্ত তার শিকার। বিশিষ্ট সমালোচকের ভাষায় -

> "একসময় যারা নদীর বুকেই জাল ফেলে দিন কাটিয়েছে, সংগ্রহ করেছে তাদের আহার তারাই পরবর্তীকালে সে বৃত্তি থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। সামাজিক বিবর্তনের একটি ঈশারা যেন তিতাসের গল্পে ঝিলকিয়ে উঠেছে। আদিম সাম্যবাদী সমাজের চেহারাটা ছিল পুরোপুরি আহার্য - সংগ্রহ - ভিত্তিক - যা তিতাস পাড়ের মালোদের জীবনের প্রথম পর্যায়ে প্রতিফলিত।"(৬)

শেষ পর্যন্ত মালোদের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও প্রতিশোধের কাহিনী হয়ে রইলো তিতাস একটি নদীর নাম। এইরকম বহু নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসে দেখা যায় মানুষের জীবন যেন কোথাও যেন একটা বাঁধা পড়ে গেছে। 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে দেখা যায় মানুষের জীবন যেন কোথাও একটা বাঁধা পড়ে গেছে। 'গহীন গাঙ' উপন্যাসে সাধন চট্টোপাধ্যায় এই চেনা পরিচিতির বাস্তবতায় উন্মোচিত করেছেন একজন শিল্পির দৃষ্টি নিয়ে। তবে এই উপন্যাসে দ্বন্দ্ব সংঘাত শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলোনা। মহাজনী শোষন প্রথা একইভাবে চলে আসছে। এই উপন্যাস তার ব্যতিক্রম হতে পারেনি। আব্দুল জব্বরের 'ইলিশমারির চর' এ ও জয়বনুদ্দির সংলাপে পাই এই এক উক্তি -

> 'শালা, মহাজন তরব - দি চাচার বৌয়ের কাছে মোর গয়না - গুলো কড়ারি বন্ধকে সব গেল। আল্লা যেতি মুখ তুলে চায়, দেনা খালাস করে' আর কটা গয়না ছড়িয়ে নিজেই একটা নৌকা করব উ - বছর।'(৭)

জেলেরা মাছ যেখানে সেখানে বিক্রি করতে পারে না কারন মহাজনের কাছে তার বাঁধা। জলপুত্র উপন্যাস দেখি মহজন শুকুর বলছে

খানকির পোয়া, ডোমর বাইচ্যা, টিয়া লইতর সমত হয় নো আছিল? বাপেরে মাছ দওনর কথা ভূলি গেইয়স দেনা? কথা নো কইস চোদানির পোয়া, মালাউনের জাত। আই সেই রইস্যা দাম দিয়্যস, হেই দামে বেচিবি দে।(৮)

একবার যদি মহাজনী জাতাকলে পড়ে যায় মানুষ তার থেকে বের হওয়া খুবই মুসকিল। এই বার্তাই শুধু নয় - মালোদের জীবন জীবীকা, তার থেকে রূপান্তর ও বিকল্প পথের সন্ধান সবকিছুই উঠেছে এসেছে গহীনগাঙ উপন্যাসে। বিশেষ কিছু সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে ঠাঁই পেয়েছে আব্দুল জব্বর এর 'ইলিশমারির চর', হরিশংকর দাসের জলপুত্র উপন্যাসে।
সামগ্রিকভাবে এই উপন্যাসগুলোর মূলসুর একই, জেলে সম্প্রদায়ের অপ্রাপ্তির বেদনা, প্রাপ্তির উল্লাস, শোষনের হাহাকার, অশিক্ষার অন্ধকার, সমস্তই লেখক লেখনীর মাধ্যমে বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।

তথ্যসূত্রঃ
১।সাধন চট্টপাধ্যায়ের গল্প বিশ্বঃ বিনির্মানের পরম্পরা বাংলা গল্প ও গল্পকার ৩য় খন্ড সম্পাদনাঃ সুমন সামন্ত।
২।উপন্যাস সমগ্র (প্রথম খন্ড), কলকাতা - ০৯, করুনা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ,
পহেলা বৈশাখ, ১৪১৮ পৃ. ১১
৩।প্রাগুপ্ত- পৃ-১৯
৪।চট্টোপাধ্যায়, সাধন, গহিন গাঙ ১৯৯৬ বই মেলা, কলকাতা ৭৩ পৃ. ৬
৫।ভট্টাচার্য, দেবাশিষ, বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা
প্রথম প্রকাশ বইমেলা-২০১০।
৬।ড. সনৎ কুমার নস্কর, সাহিত্য প্রবন্ধ সেকালে একালে প্রবন্ধিকাসং কলকাতা,
সংশোধিত সংস্করন, নভেম্বর ২০১২।
৭।ইলিশমারির চর, পৃষ্ঠা-৫।
৮।জলপুত্র, পৃ:৪৯।